

**Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)****A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture**

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 392 - 397

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

মন্মথ রায়ের ‘জয় বাংলা’ : মুজিব নামের জয়গান

ড. কৌশিক কর্মকার

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

মহারাজা নন্দকুমার মহাবিদ্যালয়, নন্দকুমার, পূর্ব মেদিনীপুর

Email ID : koushikk31@gmail.com**Received Date** 25. 06. 2025**Selection Date** 20. 07. 2025**Keyword**

Liberation War,
East Pakistan,
Bangladesh,
Independence,
Refugee, Civil
Disobedience,
Socioeconomic
Structure, Politics.

Abstract

The most significant period in the Indian subcontinent's history following 1947 was 1971. It was the year that Bangladesh, India's neighbor, won its freedom from Pakistani domination in the Liberation War. Five hundred thousand Bangladeshi women were raped and three million civilians were killed by Pakistani forces in 1971. Ten million Bangladeshis sought safety in India during the conflict, mostly in West Bengal and other states in the northeast that border Bangladesh. Consequently, West Bengal's political and socioeconomic structure was totally upended. Although Bangladesh has generated a great deal of literature on this eventful year, writers, playwrights of West Bengal have produced relatively little. A noteworthy exception to this quiet is Manmath Roy's play 'Joy Bangla'.

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was the main figure in 1971, leading students, young people, and common people in the fight for independence. People nationwide pushed themselves fully into the liberation struggle in response to his call. The nation's greatest emblem of optimism was his momentous address delivered on March 7, 1971, at the Racecourse Ground in Ramna, Dhaka. In that speech, Mujib declared: "This time the struggle is for our emancipation," thus announcing Bangladesh's independence. This time the struggle is for our independence." He urged people to make every home a fortress and called for a civil disobedience action throughout the province. The dream of liberation captivated the country. Students, young people, and women came out of every home and vowed to fight for independence.

The drama also expresses this truth. Mujib was detained in a Pakistani jail by the Pakistani authorities from the start of the conflict. However, his great remarks sparked the establishment of innumerable Mujibs in every East Pakistani home. They spread the spirit and ideals of Mujib to a wider audience. "Brave Bengalis, take up arms and liberate Bangladesh!" became their catchphrase. In the end, the play's protagonist also gives up himself. The drama shows how Mujib's principles moved and motivated the country's people. Thousands and thousands of these Mujibs appeared all over

Bangladesh during the Liberation War; these were people who understood the actual Mujib dream and made it a reality.

Discussion

ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে উনিশশো সাতচল্লিশের পর সর্বাধিক ঘটনাবল্ল সময় উনিশশো একাত্তর। একাত্তর ভারতের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাল, পাকিস্তানের অধীনতা থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সাল। একাত্তরে পাকিস্তানসেনা তিরিশ লক্ষ বাংলাদেশি নাগরিককে হত্যা করে, পাঁচ লক্ষ নারী ধর্ষিতা হয়। যুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশের এক কোটি মানুষ ভারতের পশ্চিমবঙ্গসহ বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী উত্তর পূর্ব ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নেয়। ৩৬৩০ জন ভারতীয় সেনা শহীদ হন; নিখোঁজ ও আহত সেনার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২১৩ ও ৯৮৫৬।^১ স্বাভাবিকভাবেই এহেন ঘটনাবল্ল একাত্তরকেন্দ্রিক সাহিত্য বাংলাদেশ বিপুল আকারে লিখিত হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে? পশ্চিমবঙ্গের লেখক সাহিত্যিক নাট্যকাররা কতখানি পরিস্ফুট করেছেন একাত্তরের বাস্তবকে? উত্তর কিন্তু নেতিবাচক। অথচ পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও নিদারুণ প্রভাব বিস্তার করেছিল একাত্তর। সীমান্তবর্তী প্রতিটি জেলার সড়কপথ, রেলপথ সন্নিহিত উঁচু জমিতে আশ্রয় নিয়েছিল উদ্ধাস্তরা। অপুষ্টি, রোগব্যাধিতে জরাজীর্ণ আশ্রয়হীন অসহায় উদ্ধাস্ত জনতাকে আশ্রয় দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ। নিজেদের অপরিপাক খাবার ভাগ করে নিয়েছিল তাদের সঙ্গে। আবার এই পশ্চিমবঙ্গেই গণহত্যাকারী ধর্ষক যুদ্ধবাজ পাকিস্তানিদের সমর্থন জানিয়েছিল একটি গোষ্ঠী, রাস্তায় নেমে মিছিল করেছিল কিছু রাজনৈতিক দল; যে মিছিলের স্লোগান ছিল - ‘ইন্দিরা ইয়াহিয়া এক হায়া’, ‘ইন্দিরা মুজিব নিপাত যাক’।^২

এরূপ তাৎপর্যপূর্ণ একাত্তরকে কেন্দ্র করে যে অত্যল্প নাটক পশ্চিমবঙ্গের নাট্যকাররা রচনা করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম মন্মথ রায়ের নাটক ‘জয় বাংলা’। মন্মথ রায় আদতে অবশ্য পূর্ববঙ্গের মানুষ; টাঙ্গাইলে তাঁর জন্ম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, তাই হয়তো এ বিষয়ে নাটক লেখার জন্য তিনি একটি স্বাভাবিক প্রণোদনা অনুভব করেছিলেন। গম্ভীর বিষয়কেন্দ্রিক হলেও নাট্যকার নাটকে খানিকটা কৌতুকের আশ্রয় নিয়েছেন। বস্তুত এই কৌতুকময় ঘটনাটিই নাটকের সকল ঘটনাসমূহকে একটি সূত্রে গ্রথিত করেছে, ঘটনাগত ঐক্য নির্মাণ করেছে। আদতে যিনি একাত্তরের প্রধান চরিত্র, যাঁর নির্দেশে ছাত্র-যুবসহ দেশের সকল সাধারণ মানুষ স্বাধীনতা যুদ্ধে নিজেকে সংযুক্ত করেছিল, তিনি হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। নাটকে একটি সাধারণ চরিত্র সিরাজ, পেশায় গাড়িচালক, ঢাকা শহরের একটি বস্তিতে যার বসবাস, তার বাহ্যিক আকার আকৃতি মুজিবের অনুরূপ; যাকে একদৃষ্টিতে মুজিব বলে মনে হয়। কিন্তু মুখ খুললে তো প্রমাণ হয়ে যাবে সে সিরাজ, সে মুজিব নয়; তাই তার শ্যালক ও স্ত্রী মিলে তাকে মুজিবের ‘ছয় দফা’ মুখস্থ করিয়েছে। যাতে সে প্রয়োজনে ‘ছয় দফা’ উগরে দিতে পারে। নাটকে মুসলিম লিগ নেতা, পুলিশ অনেকের কাছেই সে নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন রাখতে সমর্থ হয়। কিন্তু ছাত্র নীলমণির কাছে এসে সে ধরা পড়ে যায় কারণ নীলমণি আসল মুজিবকে প্রত্যক্ষ করেছে, ঢাকাতে তাঁর বক্তৃতা শুনেছে। নীলমণি যখন জাল মুজিব সিরাজের স্বরূপ উন্মোচনের কথা চিন্তা করছে, তখন তার প্রেমিকা তাকে সেই কাজে নিরস্ত করে। কারণ হিসেবে মীনা তার সংলাপে যা উল্লেখ করে, তা যেন নাট্যকারের বার্তা হিসেবেই প্রকাশিত হয় - ‘আজ সবচেয়ে বড় কথা মুজিব নয়, মুজিবের বাণী, মুজিবের আদর্শ। আর, সেই আদর্শ পালনের জন্য রয়েছে আমরা। আজ প্রতিটি বাঙালীই মুজিব। কত মুজিবকে ওরা ধরবে।’ বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষই এক একজন মুজিব। নেতার প্রতি এরূপ আস্থা সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতার লড়াইয়ে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল।

নাটকের ঘটনাক্রম সূচিত হচ্ছে ছাব্বিশে মার্চের সন্ধ্যা রাত্রিতে। নাটকের অন্যতম চরিত্র সিরাজ, তার স্ত্রী ও শ্যালককে নিয়ে ঢাকা শহর ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুতিরত; উচ্চ রাজকর্মচারী মুসলিম লিগ সদস্য ওসমান চৌধুরীর কন্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী মীনা চৌধুরী যুদ্ধে शामिल হতে চায়; তার প্রেমিক নীলমণি কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত কারণ ‘গেল ‘রায়টে’ গাঁয়ের মুসলমানরা আমাদের বাড়ীর সবাইকে কচুকাটা করেছিল’। সে ও তার ঠাকুমা কলকাতায় থাকায় তারা বেঁচে গিয়েছিল। সে তার প্রেমিকাকে নিয়ে ওপার বাংলায় পালিয়ে যেতে চায়, কিন্তু তার প্রেমিকা যুদ্ধে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তার প্রেমিকার বাবা ওসমান সাহেবের কাছে শেখ মুজিব অবশ্য ‘বঙ্গবন্ধু’ নন, ‘বঙ্গশত্রু’ কারণ ‘এতবড় একটা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে

সজ্জিত শক্তিকে অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে গেলে, যে বিরাট প্রস্তুতির আবশ্যিক ছিল মুজিবর তা না করেই হঠাৎ এই দেশব্যাপী বিদ্রোহের ডাক দিয়ে, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে যে হঠকারিতা করলেন তাতে সমগ্র বাংলাদেশ জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, যাবে। ইতিহাসে এমন আহাম্মুকির আর নজীর নেই।’ প্রত্যুত্তরে তার কন্যা মীনা তাকে জানায়: ‘একটা জাতির জীবন - একটা জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা - একটা জাতির স্বপ্ন অন্ধ কষে বিচার বিবেচনা করে গড়ে ওঠে না, আকাঙ্ক্ষা। জাতীয় সম্মানের প্রশ্নে, স্বাধীনতার প্রশ্নে চুলচেরা বিচারের কোন স্থান নেই। পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে মিলিটারি দাপটে দাবিয়ে রেখে পূর্ববাংলার অফুরন্ত ঐশ্বর্য শোষণ করেছে; এতে পশ্চিম দিন দিন যত ধনী হচ্ছে পূর্ব বাংলা তেমনি হচ্ছে নির্ধন। আজ সমগ্র বাংলাদেশ পশ্চিম পাকিস্তানের দাসত্বের উপনিবেশ।’ উভয়েই উভয়ের যুক্তিতে যথাযথ। আজকের বাংলাদেশে যখন ভারত বিরোধিতার প্রকল্প প্রকট হচ্ছে, যখন প্রচার হচ্ছে ইন্দিরা গান্ধী ও মুক্তিবাহিনী মিলে ষড়যন্ত্র করে ভাইয়ে ভাইয়ে গুণ্ডগোল লাগিয়েছে, তখন দেখে নেওয়া যাক বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতার মূর্ত প্রতীক ওয়াহিদুল হক এ প্রসঙ্গে কি বলেছিলেন - ‘ভারতের সাহায্য না পেলে আমাদের অবস্থা হতো প্যালেস্তাইনদের মতো। আমরা ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর লড়াই চালিয়ে যেতাম এবং স্বাধীনতা আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যেত।’^৩ ‘নির্দলীয় ইতিহাস’ রচয়িতা, অন্যতম বাংলাদেশি চিন্তক গোলাম মুরশিদের মতে - ‘অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পশ্চিমা সৈন্যদের সঙ্গে বাঙালিরা যুদ্ধ করছিলেন ৩০৩ রাইফেল আর কিছু এলএমজি দিয়ে। তাঁদের কাছে তিন ইঞ্চির থেকে বড়ো কোনো মর্টার লঞ্চও ছিলো না। এক কথায়, তাঁদের কাছে ভারী অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাগুলি বলতে গেলে ছিলোই না।’^৪ ওসমান সাহেবের বক্তব্যের সারবত্তা এখানে খুঁজে পাওয়া যায়। তবে বাংলাদেশ যে স্বাধীনতা লাভের সমর্থ হয়েছিল তার পশ্চাতে ছিল মীনার মত অসংখ্য বাংলাদেশি ছাত্র-যুব’র অদম্য জেদ আর ভারত সরকারের অকুণ্ঠ সহায়তা। উভয়েই এক্ষেত্রে পরিপূরক হিসেবে কাজ করেছিল।

শহীদ জননী জাহানারা ইমাম তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘একাত্তরের দিনগুলি’র পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন তাঁর পুত্র রুমি সহ তাঁর বন্ধুরা কীভাবে যুদ্ধ লড়ার তাগিদে সানন্দে গৃহত্যাগ করেছিল। দেশের ছাত্র-যুবদের স্বাধীনতার লড়াইয়ে এভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার কারণ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের দীর্ঘ বঞ্চনা ও বৈষম্যের ইতিহাস। পূর্ব পাকিস্তান হয়ে উঠেছিল পশ্চিমের উপনিবেশ, নাটকে যা মীনার সংলাপে ফুটে উঠেছে। কেবল মাত্র ইসলামিক সংহতির উপর নির্ভর করে পাকিস্তান গড়ে উঠলেও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রভাবশালীরা পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রকৃত মুসলিম মনে করেনি।^৫ ফলত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিপুল বঞ্চনার শিকার হয় তাঁরা; সরকারি চাকরিতে তাঁদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫ শতাংশ।^৬ অপ্রাপ্তির এই দীর্ঘ ইতিহাস পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকদের ক্ষুব্ধ করেছিল, উত্তেজিত করেছিল। আর সেই বঞ্চনার ক্ষোভকেই তাঁরা হাতিয়ার করে স্বাধীনতার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয় যখন সত্তরের নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও মুজিবকে সরকার গড়তে দেওয়া হয় না; দেশের সকল শ্রেণির মানুষ এই বাস্তব সম্পর্কে অবগত ছিল। নাটকে তাই লক্ষ করা যায় ওসমান সাহেবের বাড়িতে যারা বাবুর্চি, খানসামার কাজ করে, তারাও বুঝে গিয়েছিল তাদের অধিকার বুঝে নেওয়ার সময় সমাগত। তাই মালিকের প্রতি তাদের দৃষ্ট সংলাপ ছিল এরূপ - ‘একেবারেই মরুম হজুর, দুইবার তো মরুম না।’ নাটকে লক্ষ করা যায় তারা বাড়ির বাইরে বেরনোর সঙ্গে সঙ্গেই পাক সেনা তাদের গুলি করে হত্যা করে।

এই ঘটনার অব্যবহিত পূর্বেই ওসমান সাহেব তাঁর সংলাপে জানাচ্ছেন, ২৫ মার্চ থেকে ২৬ মার্চ, ‘এক দিনের মধ্যেই টিকা খাঁর হুকুমে সৈন্যরা নির্বিচারে মেশিনগানে, কামানে, ঢাকা শহরে অন্তত: পঞ্চাশ হাজার লোককে মেরে ফেলেছে। পাক সেনা কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যা পর্বটি দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী ও সারা বাংলাদেশ জুড়ে চলেছিল। নাটকে এর ঠিক আগের অংশে রেডিওর ঘোষণা সূত্রে বলা হচ্ছে ‘বৃহস্পতিবার মধ্যরাত্রে পাক সশস্ত্রবাহিনী ঢাকার পিলখানা ও রাজারবাগে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস ও পুলিশ বাহিনীর উপর হঠাৎ আক্রমণ চালায় বহু নিরস্ত্র লোক নিহত।’ বস্তুত পাক সেনার প্রাথমিক আক্রমণের লক্ষ্য ছিল এই দুটি স্থান। নাটকে হতাহতের বিষয়ে সাধারণভাবে এইটুকু তথ্যই প্রদত্ত হয়েছে। কিন্তু একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে যা ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত হয়ে আছে, তা হল পাক বাহিনী কৃত গণহত্যা। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে সেই গণহত্যার ন্যূনতম চিত্র নাটকে পরিস্ফুট হল না। পিলখানা, রাজারবাগের সঙ্গে অন্তত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামটি উল্লিখিত হওয়া সমীচীন ছিল; নিদেন পক্ষে জগন্নাথ হলের নাম; কারণ পিলখানা, রাজারবাগের সঙ্গে

প্রথম রাতে পাক সেনার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল ও জগন্নাথ হল। যেখানে নাট্যকার নিজেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন ও জগন্নাথ হলের আবাসিক ছিলেন, সেখানে এই প্রতিষ্ঠানের নাম অনুস্মারিত থাকা সততই বিস্ময়কর। নাট্যকার কি ‘প্রগতি সাহিত্যের তত্ত্বকাঠামো’ মেনে চলতে গিয়ে এ বিষয়ে নীরব থাকলেন? তাঁর কি মনে হয়েছিল গণহত্যার বৃত্তান্ত নাটকে ফুটে উঠলে তা সংঘের লাইন বিরোধী হয়ে উঠবে! নাটকে গণহত্যা বিষয়ক অপর যে তথ্যটি উল্লিখিত হয়েছে লিগ নেতা সাহাবুদ্দিনের সংলাপে, তা হল ‘দারোগা সাহেবের কাছে তো শুনলাম মিলিটারী আইতেছে। তারা আইবার কালে পথের ধারের যত বাড়ি ঘর সব জ্বালাইয়া পোড়াইয়া আইতে আছে। আওয়ামী লীগের লোক খুইজা বাই কইরা পাইকারী হারে খতম করতে আছে।’ কিন্তু কেবল আওয়ামী লীগ কর্মীদেরই কি খুঁজে খুঁজে হত্যা করা হয়েছে? খুঁজে খুঁজে হত্যা করা বিষয়ে একাত্তরের ইতিহাসে যে তথ্যগুলি পাওয়া যায় তা একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে -

১। পাকিস্তানিদের চোখে কারা প্রধান শত্রু ছিল, সেটা বোঝার অন্যতম উপায় ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ রাতে তাদের আক্রমণের স্থানগুলো লক্ষ্য করা। পিলখানা ও রাজারবাগ ছিল সশস্ত্র প্রতিরোধের স্থান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তরুণ বিদ্রোহীদের কেন্দ্রস্থল, যেমন ইকবাল হল (শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল)। শিক্ষকরা ছিলেন তাদের গুরু, যাদের ভূমিকার জন্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রসারিত হয়েছিল।

কিন্তু জগন্নাথ হল ছিল অন্য ধরনের একটি লক্ষ্য। এটি কোনো প্রতিরোধের কেন্দ্রস্থল ছিল না। বিশেষ করে, চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের কোয়ার্টার। যার বাসিন্দারা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত পর্যন্ত ছিলেন না। অন্যটি হচ্ছে রমনার কালীমন্দির, এটিরও কোন রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল না। সেই রাতের পরপরই, অন্য যেসব স্থানে পাক আর্মি আক্রমণ চালিয়েছিল, তার মধ্যে একটি ছিল শাঁখারী পট্টি - যেখানে হিন্দু নারীদের জন্য শাখা-পলা তৈরি করা হত। অর্থাৎ মূল পাঁচটি আক্রমণের কেন্দ্রস্থলের মধ্যে তিনটিই ছিল অরাজনৈতিক হিন্দু জনগোষ্ঠীর ওপর। এর কোনোটিতে কোনো প্রতিরোধ হয়নি। পাকিস্তানি আক্রমণকারীদের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক বা সশস্ত্র শক্তির পাশাপাশি কেবল ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে, হিন্দু জনগোষ্ঠীর মানুষেরা শত্রু হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল।

পাকিস্তানিদের কাছে বাংলাদেশের মানুষ সবল মুসলমান ছিল না। তারা মনে করতো যে এখানকার মানুষ হিন্দু সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু একই সাথে স্মরণ রাখা দরকার যে বহু হিন্দু বাঙালিকে ধর্মের জন্য হত্যা করা হয়েছে।^১

২। পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রধান শত্রু ছিল ভারত। যেহেতু পশ্চিম পাকিস্তান ছিল কেন্দ্র, তাই কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের প্রধান শত্রু হয়ে ওঠে ভারত। এর সম্প্রসারিত ফল হচ্ছে, যাদেরকে ভারতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা যায়, তাদেরকেও পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রধান শত্রুতে পরিণত করা। সরল অর্থে, ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ অর্থাৎ হিন্দু জনগোষ্ঠী পাকিস্তানের প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত হয়। অতএব, পাকিস্তানের সব হিন্দুও রাষ্ট্রের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে এ দেশের হিন্দু জনগোষ্ঠীকে গণহত্যার শিকার হতে হয়।^২

৩। আসলে, হিন্দুরা পাকিস্তানের শত্রু এবং ভারতের দালাল বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন। ফলে কেবল এই রাতে নয়, মুক্তিযুদ্ধের ন মাসই হিন্দুদের ওপর নির্মমভাবে অত্যাচার চালানো হয়েছিলো। (ম্যাসকারেনহাস, ১৯৭১) নির্মম নির্যাতন করতে পাক সেনারা অকুণ্ঠ ছিলো। কিন্তু হিন্দু নারীদের ধর্ষণ করে হত্যা করা, শিশু-বৃদ্ধসহ হিন্দু পুরুষদের নির্বিচারে হত্যা করা এবং তাঁদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে পাকসেনা এবং তাদের দোসর রাজাকারেরা একটু বেশি বিশেষ উৎসাহী ছিলো। (সরকার, ২০০৬) বিদেশি সাংবাদিকদের বিবরণ থেকে জানা যায়, হিন্দু নিধনের কাজ চালানো হয়েছিলো পদ্ধতিগতভাবে এবং নীতি হিশেবে। (ডেইলি টেলিগ্রাফে লোশাকের রিপোর্ট, সেন্ট পিটার্সবার্গ টাইমস, ভার্জিন আইল্যান্ডস ডেইলি নিউজ, সানডে টাইমস [১৩ জুন], টাইমস [৫ জুন], সানডে টাইমস [১৩ জুন] এবং নিউইয়র্ক টাইমসের বিভিন্ন সংখ্যা, অ্যান্টনি ম্যাসকারেনহাসের দ্য রেইপ অব বাংলাদেশ [১৯৭১] গ্রন্থ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য) আসলে, পাকিস্তান-কর্তৃপক্ষ চেয়েছিলো হিন্দুদের ভয় দেখিয়ে দেশছাড়া করতে। যাতে পূর্ব পাকিস্তান পুরোপুরি মুসলমানদের দেশে পরিণত হয়।^৩

৪। কেন্দ্রীয়, জেলা ও থানা স্তরে ‘শান্তি কমিটি’ গঠন করা হয়। শান্তি কমিটির সদস্যরা ‘রাজাকার’ নামে পরিচিত ছিল। তারা স্বাধীনতা আন্দোলন বিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত ছিল। শুধুমাত্র তাই নয়, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী অধিকৃত বাংলাদেশে সমস্ত হিন্দুকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। রাজাকারদের সহায়তায় তারা লক্ষ লক্ষ মহিলার ওপর শারীরিক নির্যাতন চালায়।^{১০}

৫। পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যার এক-দশমাংশ ছিলেন হিন্দুরা। যদিও সেনাবাহিনী হাজার হাজার রাষ্ট্র বিরোধী বাঙালি মুসলিমদের হত্যা করে, সামরিক শাসনকর্তারা স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের জন্য ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের অনুচরদের দোষারোপ করতে শুরু করলে হিন্দুরা সেনাবাহিনীর হামলার বিশেষ লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। সেনাবাহিনী হিন্দুদের ঘরবাড়ি লুণ্ঠ ও পুড়িয়ে ফেলার জন্য হিন্দুদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন মুসলমানদের বাধ্য করে। মুসলমানদের এই বলে হুমকি দেয়া হয় যে, তারা যদি হিন্দুদের আক্রমণ না করে, তাহলে তাদেরই হত্যা করা হবে।^{১১}

‘খুঁজে খুঁজে হত্যা’ কাণ্ডের প্রকৃত লক্ষ্য ছিল হিন্দুরা। হিন্দু পুরুষদের পরীক্ষা করার জন্য পাক সেনা লিঙ্গগ্রহেদন (সারকামসেশন) ও মহিলাদের ক্ষেত্রে কলমা বলার পরীক্ষা নিত।^{১২} শেষোক্ত উদ্ধৃতিটিতে যে হিন্দুদের আক্রমণ করার জন্য মুসলমানদের হুমকি প্রদানের যে বিষয়টি উঠে এসেছে, সেই বিষয়টি অবশ্য নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে; যেখানে দেখা যায় লীগ নেতা সাহাবুদ্দিন মুসলমানদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানাচ্ছেন - ‘এখনই গাঁয়ের হিন্দু কাফের গুলান্নে পুড়াইয়া মারো। মিলিটারী যদি আইসা পড়ে আমি দেখাইয়া দিমু তোমরা আমাগো ইসলাম রাষ্ট্রের কত বড় বন্ধু। এই যা পথ বাতলাইয়া দিলাম না, এই বিপদে ঐ হইল একমাত্র মোক্ষম দাওয়াই।’

নাটকের শুরুতে প্রেমিকা মীনার নির্দেশে যে নীলমণি সিরাজের প্রকৃত চরিত্র উন্মোচনে বিরত হয়েছিল, নাটকের শেষাংশে সেই নীলমণি সিরাজকে একান্তে পেয়ে বলে বসে ‘আমি ঢাকায় অন্যান্য ছাত্র নেতাদের সঙ্গে মুজিব ভাইয়ের কাছে অনেকবার গিয়েছি, কথা বলবার সুযোগও পেয়েছি। দেখতে অনেকটা একরকম হলেও আপনি জাল মুজিব।’ প্রবঞ্চনা ধরা পড়ে যাওয়ায় সিরাজ যখন অনুতপ্ত তখন নীলমণি অবশ্য তাকে বোঝায় সে জনমানসে বর্তমানে চিহ্নিত হয়ে গেছে আসল মুজিব রূপে। তার উপস্থিতি জনগণকে উদ্দীপ্ত করবে, সংঘবদ্ধ করবে। কাজেই তাকে এই অভিনয় চালিয়ে যেতে হবে। স্বভাবতই স্বয়ং নেতা মুজিব তাদের সঙ্গে আছেন ভেবে গ্রামের পুলিশ, গ্রামবাসী পুলিশ সকলেই মুক্তিবাহিনীর লড়াইয়ের আদর্শ দীক্ষিত হয়। তারা জ্ঞানগান দিতে থাকে ‘বীর বাঙালি, অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন কর’। তাকে ঘিরে সকলে বলে ওঠে ‘বঙ্গবন্ধু জিন্দাবাদ’। কিন্তু নিজের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করতে করতে ক্লান্ত সিরাজ এক সময় জনগণের সামনে ঘোষণা করে - ‘আমি মুজিবুর রহমান নই। হ্যাঁ হ্যাঁ সবাই বিশ্বাস কর, আমি জাল মুজিব।’ যে নীলমণি নাটকের সূচনা অংশ থেকে সিরাজের প্রকৃত পরিচয় উদ্ঘাটনে উদগ্রীব ছিল, সেই নীলমণি তাকে সত্যবাচনে বিরত করতে চেষ্টা করে। তাকে ‘মুজিবভাই বঙ্গবন্ধু মুজিবভাই’ নামে সম্বোধন করে বলে ‘আজ এই ছলনা আপনার শোভা পায় না’। নাটকের সূচনা অংশে লক্ষ করা যায়, যে সিরাজ প্রাণের ভয়ে ঢাকা শহর ছেড়ে পলায়নে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, নাটকের সমাপ্তিতে সেই সিরাজই নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে। পিছনে জ্ঞানগান ওঠে ‘বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান জিন্দাবাদ’। আত্মপরিচয় লুকনো, ‘ছয় দফা’ মুখস্থ করা, বক্তৃতার বিশেষ ভাষাব্যবহার শেখা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে নাটকে একটি কৌতুকপূর্ণ পরিসর নির্মিত হয়েছিল; সমাপ্তিতে তা ট্রাজেডির রূপ পরিগ্রহণ করে। আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে সিরাজ তার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করে। চেহারা এক না হলেও আদর্শগতভাবে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশে এরূপ শত সহস্র মুজিব গড়ে উঠেছিল, যারা আসল মুজিবের স্বপ্নকে সাকার করেছে; তাকে বাস্তবে রূপদান করেছে। আসল নকলে এক রকম অভেদত্ব ঘোষণার মধ্য দিয়েই নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে।

Reference:

১. আজাদ, সালাম, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ২০১৪, নয়াদিল্লি, পৃ. xiv
২. Sachi G Dastidar, Bengal's Hindu Holocaust : The Partition of India and Its Aftermath, 2021, Garuda Prakashan Private Limited, Gurugram, p. 100
৩. আজাদ, সালাম, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ২০১৪, নয়াদিল্লি, পৃ. xiv

৪. মুরশিদ, গোলাম, মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর: একটি নির্দলীয় ইতিহাস, প্রথমা প্রকাশন, ২০২২, ঢাকা, পৃ. ৯০
৫. আজাদ, সালাম, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ২০১৪, নয়াদিল্লি, পৃ. ৮৯
৬. ঐ, পৃ. ৮৬
৭. চৌধুরী, আফসান (সম্পাদ.), হিন্দু জনগোষ্ঠীর একাত্তর, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০২২, ঢাকা, পৃ. xi
৮. ঐ, পৃষ্ঠা xii
৯. মুরশিদ, গোলাম, মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর: একটি নির্দলীয় ইতিহাস, প্রথমা প্রকাশন, ২০২২, ঢাকা, পৃ. ৮২
১০. আজাদ, সালাম, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ২০১৪, নয়াদিল্লি, পৃ. ১৪৬
১১. ঐ, পৃষ্ঠা ১৫৮
১২. Sachi G Dastidar, Bengal's Hindu Holocaust : The Partition of India and Its Aftermath, 2021, Garuda Prakashan Private Limited, Gurugram, p. 185